



## অধ্যায় ৯

সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের ঘূর্ণন ও  
তাদের আপেক্ষিক অবস্থান

# সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের ঘূর্ণন ও তাদের আপেক্ষিক অবস্থান

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ দিন-রাত ও ঋতু পরিবর্তন
- ☑ আর্হিক গতি ও বার্ষিক গতি
- ☑ ভৌগোলিক রেখা
- ☑ ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়ার পার্থক্য
- ☑ পৃথিবীর ওপর চাঁদের প্রভাব
- ☑ সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের আপেক্ষিক অবস্থান

সৌরজগতে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। আবার চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সে কারণে বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অমাবস্যা-পূর্ণিমা এবং ঋতুর পরিবর্তন ঘটে থাকে।

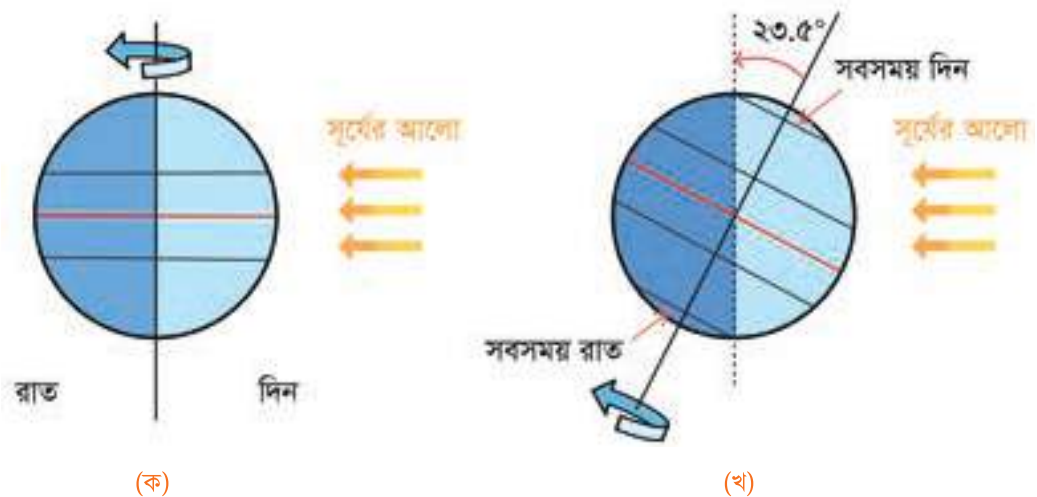
## দিন-রাত ও ঋতু পরিবর্তন

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবে যে বছরের সব সময় দিন এবং রাত সমান দৈর্ঘ্যের হয় না। গ্রীষ্মকালে দিনগুলো হয় লম্বা, বিকেলে স্কুল ছুটির পর খেলাধুলার জন্য অনেকটা সময় পাওয়া যায়। আবার শীতকালে দিন হয় ছোট, দেখা যায় সূর্য উঠতে সকালে অনেক দেরি হয়, আবার সন্ধ্যা অনেক তাড়াতাড়ি নেমে আসে। এ সবকিছুই হয় পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণন বা আর্হিক গতি এবং সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতির কারণে।



## স্রাষ্টিক গতি

মহাকাশে পৃথিবী স্থির নয়, সেটি তার নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এই ঘূর্ণনের দিক হচ্ছে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে (ছবি ১) সে জন্য আমরা সূর্যকে পূর্বদিকে উদয় হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে দেখি। এই ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্য থেকে আসা আলো এবং অক্ষকারের একটি চক্র ২৪ ঘণ্টায় সমাপ্ত হয় যাকে আমরা দিন-রাত বলি। পৃথিবী যদি পুরোপুরি খাড়াভাবে নিজ অক্ষে ঘুরত তাহলে পুরো পৃথিবীর সব জায়গায় ১২ ঘণ্টা দিন এবং ১২ ঘণ্টা রাত হতো। কিন্তু পৃথিবীর অক্ষ যেহেতু ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে নিজ অক্ষের উপর ঘোরে, তাই কোথাও দিন লম্বা, কোথাও ছোট, এমনকি উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি একটানা অনেকদিন ধরে দিন এবং অনেকদিন ধরে রাত থাকতে পারে।



(ক) পৃথিবী যদি তার অক্ষে খাড়াভাবে ঘুরতো তাহলে সবজায়গায় ১২ ঘণ্টা দিন এবং ১২ ঘণ্টা রাত হতো। ঋতুর কোনো পরিবর্তন হতো না (খ) পৃথিবী যেহেতু তার কক্ষপথের সাপেক্ষে ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে ঘুরে কোথাও লম্বা এবং কোথাও ছোট দিন পাওয়া যায়।

## বার্ষিক গতি

পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে একবার ঘুরে আসে। প্রতি বছরে ৩৬৫ দিনের পর বাড়তি ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড থেকে যাওয়ায় চার বছর পর সেটি বেড়ে বেড়ে প্রায় একদিনের সমান হয়ে যায় তাই সেটাকে হিসেবের মধ্যে আনার জন্য চার দিয়ে বিভাজ্য বছরগুলোতে ফেব্রুয়ারি মাসে ১ দিন যোগ করে ২৮ এর বদলে ২৯ দিনে মাস গণনা করা হয়। এই বছরগুলোকে লিপ ইয়ার বলে। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর একটি পূর্ণাঙ্গ আবর্তনকালকে বার্ষিক গতি বলা হয়। আমরা এই সময়কে পৃথিবীতে একটি বছর হিসেবে গণনা করি।

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ পুরোপুরি খাড়া না হয়ে ২৩.৫° (সাড়ে তেইশ ডিগ্রি) হলে থাকার কারণে দিন-রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়। সূর্যের আলো যেখানে যত খাড়া বা লম্বভাবে পড়বে, সেই স্থান তত বেশি সূর্যের উত্তাপ পাবে এবং গরম হবে। আবার বছরের অন্য সময় যখন সূর্যের আলো বাঁকাভাবে পড়বে, তখন সূর্যের আলো অনেক বড় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে বলে কম উত্তাপ পাবে।

সে কারণে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়। তবে আগে আমরা দেখি পৃথিবীর অক্ষ  $23.5^\circ$  কোণে হেলে থাকা বলতে কী বোঝায়। পৃথিবীর কক্ষপথকে যদি আমরা একটি সমতল পৃষ্ঠ বা থালা হিসেবে ধরি তবে তার ওপর একটি লম্ব কল্পনা করলে পৃথিবীর কক্ষপথ সেই লম্বের সঙ্গে  $23.5^\circ$  কোণ তৈরি করবে।

## ভৌগোলিক রেখা

পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণ করার জন্য তার ওপর কয়েকটি কাল্পনিক রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেখাটির নাম বিষুব রেখা এবং এটি পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। বিষুব রেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ করেছে। এর পরের গুরুত্বপূর্ণ রেখা দুটির নাম কর্কট ক্রান্তি এবং মকর ক্রান্তি। কর্কট ক্রান্তি রেখাটি বিষুব রেখার সাপেক্ষে  $23.5^\circ$  ডিগ্রি উত্তরে এবং মকর ক্রান্তি  $23.5^\circ$  ডিগ্রি দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত (ছবি)। তোমরা জেনে খুশি হবে যে কর্কট ক্রান্তি রেখাটি আমাদের বাংলাদেশের ঠিক মাঝখান দিয়ে গেছে এবং সে কারণে বছরের নির্দিষ্ট দিনে আমরা কিছু চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা পেয়ে থাকি! বিষুব রেখা ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক রেখা আছে, সেগুলো সম্পর্কে তোমরা পরে জানতে পারবে।



ছবি: পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থা বিশ্লেষণ করার জন্য সেটিকে বিষুব রেখা, কর্কট ক্রান্তি এবং মকর ক্রান্তি এরকম কয়েকটি কাল্পনিক রেখায় ভাগ করা হয়েছে।

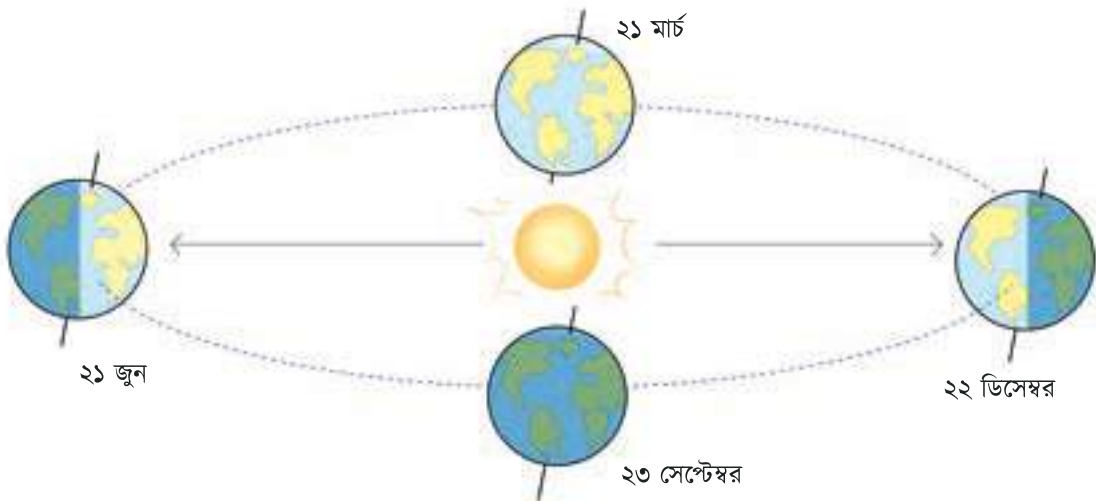
## ঋতু

পৃথিবীর বছরের ৩৬৫ দিনকে আবহাওয়া, দিন-রাতের দৈর্ঘ্য এবং প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। বছরের এই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত সময়গুলো ঋতু নামে পরিচিত। বেশিরভাগ দেশে পুরো বছরকে শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎ এই চারটি ঋতুতে ভাগ করা হয়। আমাদের দেশ খুবই বিরল কয়েকটি দেশের একটি যার নিজস্ব ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জি আছে এবং সেই অনুযায়ী বাংলা মাস ব্যবহার করে পুরো বছরকে নিচের ছয়টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে।

- » গ্রীষ্ম: বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল মাঝামাঝি — জুন মাঝামাঝি)
- » বর্ষা: আষাঢ় ও শ্রাবণ (জুন মাঝামাঝি — আগস্ট মাঝামাঝি)
- » শরৎ: ভাদ্র ও আশ্বিন (আগস্ট মাঝামাঝি — অক্টোবর মাঝামাঝি)
- » হেমন্ত: কার্তিক ও অগ্রহায়ণ (অক্টোবর মাঝামাঝি — ডিসেম্বর মাঝামাঝি)
- » শীত: পৌষ ও মাঘ (ডিসেম্বর মাঝামাঝি — ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি)
- » বসন্ত: ফাল্গুন ও চৈত্র (ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি — এপ্রিল মাঝামাঝি)

বিষুব রেখার কাছাকাছি অঞ্চলকে বিষুবীয় অঞ্চল বলে, সেখানে সারা বছরই সূর্যের আলো মোটামুটি খাড়া ভাবে পতিত হয় বলে ঋতুর পরিবর্তন খুব ভালোভাবে অনুভূত হয় না।

পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ার সময় বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আপতিত হয়। যেমন ২১ জুন সূর্যের আলো কর্কট ক্রান্তির ওপর একেবারে খাড়াভাবে আপতিত হয় (ছবি), সেই দিনটি উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে লম্বা দিন। লম্বা দিন এবং খাড়াভাবে সূর্যের আলো পড়ার জন্য এই সময়টি উত্তর গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল। আবার এই সময়টিতে দক্ষিণ গোলার্ধের মকর ক্রান্তি রেখার ওপর থেকে সূর্যকে দেখলে মনে হবে সূর্যটি উত্তরদিকে ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে হেলে আছে। দিনগুলো ছোট এবং রাত দীর্ঘ। ছোট দিন এবং হেলে থাকা সূর্যের আলোর কারণে তখন দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য শীতকাল।



ছবি: ২১ জুন সূর্যের আলো কর্কট ক্রান্তির ওপর খাড়াভাবে আপতিত হয় এই সময়টি উত্তর গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য শীতকাল। ২২ ডিসেম্বর সূর্যের আলো মকর ক্রান্তির ওপর খাড়া ভাবে আপতিত হয় এবং সেটি দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল এবং উত্তর গোলার্ধের জন্য শীতকাল।

তারপরের ছয় মাস সূর্যকে ঘিরে আবর্তন করার সময় পৃথিবীতে সূর্যের আলো কর্কট ক্রান্তির ওপর থেকে দক্ষিণ দিকে সরে যেতে থাকে এবং ঠিক ছয়মাস পরে ২২ ডিসেম্বর সূর্যের আলো মকর ক্রান্তির ওপর ঠিক খাড়া ভাবে আপতিত হয়। সেখানে দিন দীর্ঘ এবং খাড়াভাবে সূর্যের আলো থাকার কারণে সেটি দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল। তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ তখন কর্কট ক্রান্তির ওপর থেকে তাকালে মনে হবে সূর্য হেলতে হেলতে দক্ষিণ দিকে সবচেয়ে বেশি ২৩.৫ ডিগ্রি হেলে গেছে।

২১ জুন এবং ২২ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, অর্থাৎ ২১ মার্চ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর সূর্যের আলো আপতিত হয় কর্কট ক্রান্তি এবং মকর ক্রান্তি রেখার ঠিক মাঝখানে, অর্থাৎ বিষুব রেখার ওপর। বুঝতেই পারছ তখন দিন এবং রাত হয় ঠিক ১২ ঘণ্টা করে। এর ফলে এই সময় ঠান্ডা ও গরমের মাঝামাঝি একটা আবহাওয়া অনুভূত হয়। প্রাচীন অনেক সভ্যতার মানুষের কাছে এই দিনগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি এই দিনগুলো মেনে পালন করা হতো।





## ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়ার পার্থক্য

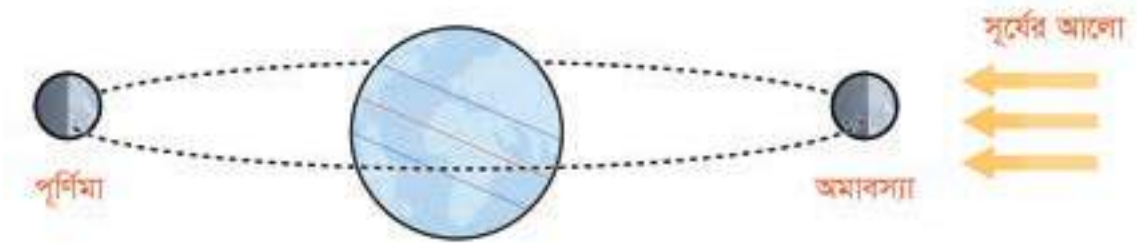
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া দেখা যায়। যেমন বাংলাদেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত বেশ ভালোভাবে অনুভূত হয়। বর্ষাকালে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার মেরু অঞ্চলের শীতের সঙ্গে আমাদের দেশের শীতের তুলনা চলে না। মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি এলাকাগুলোতে বছরের অনেকটা সময় শীত থাকে। এমনকি কিছু কিছু এলাকা সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। আফ্রিকা, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশের আবহাওয়া মূলত গ্রীষ্মপ্রধান এবং শুষ্ক। এই যে বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া বিভিন্ন রকম হয়, তা মূলত নির্ভর করে সেই এলাকার অবস্থান, জলাশয় বা পানির উপস্থিতি, উদ্ভিদের তথা বনাঞ্চলের উপস্থিতি ইত্যাদির ওপর। তবে সবকিছুর মূলে রয়েছে সৌরশক্তির (আলো এবং তাপ) কতটুকু পাওয়া যাবে তার ওপর। বিস্মুবরেখা, কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি রেখা ও তার কাছাকাছি এলাকায় সূর্যরশ্মি লম্বভাবে বা  $90^\circ$  কোণের কাছাকাছি কোণে পড়ে বলে সেসব এলাকায় আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে থাকে। আবার মেরু অঞ্চল এবং তার সংলগ্ন এলাকায় সূর্যরশ্মি তির্যক বা বাঁকাভাবে পড়ে বলে সেখানে উষ্ণতা কম এবং শীত বেশি হয়ে থাকে।

তবে কোনো এলাকার উচ্চতাও সেই এলাকার আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারে। যেমন উঁচু পর্বতে তাপমাত্রা একই অক্ষাংশের সমতলভূমির তাপমাত্রার তুলনায় অনেক কম হতে পারে। এর কারণ হলো, বায়ুমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা নিচের স্তরে যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, বায়ুর তাপমাত্রা তত কমতে থাকে।

## পৃথিবীর ওপর চাঁদের প্রভাব

### চন্দ্রকলা

তোমরা সবাই আকাশে চাঁদ দেখে মুগ্ধ হয়েছ। পৃথিবীর আঙ্গিক গতির জন্য সূর্যের মতোই চাঁদ পূর্ব দিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এক দিন থেকে পরের দিন সূর্যের আকার আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আমরা চাঁদের আকৃতির পরিবর্তন হতে দেখি। পূর্ণিমার ভরা চাঁদ ক্ষীণ হতে হতে অমাবস্যায় পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার নতুন চাঁদ ধীরে ধীরে বড় হয়ে পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত হয়। আসলে চাঁদের আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না, চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই, সূর্যের আলো চাঁদের যে অংশে পড়ে, আমরা সেই অংশটা দেখতে পাই। এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ার সময়



ছবি: সূর্যের আলো দিয়ে পুরো চাঁদ আলোকিত হলে আমরা পূর্ণিমা বলে থাকি। চাঁদের বিপরীত দিক আলোকিত হলে আমরা চাঁদকে দেখতে পাই না এবং আমরা সেটাকে অমাবস্যা বলি।

সূর্যের সাপেক্ষে তার অবস্থানের জন্য চাঁদের আলোকিত অংশের আকার প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। চাঁদের আলোকিত অংশের এই পরিবর্তনের একটি সুন্দর নাম আছে, সেটি হচ্ছে 'চন্দ্রকলা'।

চন্দ্রকলার বিষয়টি বোঝার জন্য সূর্য এবং পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদ কোথায় আছে সেটি জানতে হয়। পৃথিবীকে ঘিরে ঘূর্ণনের সময় চাঁদ যখন পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে থাকে, সূর্যের আলো তখন চাঁদের পিছন দিকটি আলোকিত করে, পৃথিবী থেকে আমরা সেই আলোকিত অংশটি দেখতে পাই না বলে চাঁদ আমাদের সামনে অদৃশ্য থাকে এবং আমরা সেই



ছবি: ভেতরের বৃত্তটিতে চাঁদের প্রকৃত অবস্থান এবং তার আলোকিত অংশটি দেখানো হয়েছে। বাইরের বৃত্তটিতে পৃথিবী থেকে চাঁদকে দেখলে কেমন দেখাবে বা চন্দ্রকলা দেখানো হয়েছে।



সময়টাকে বলি অমাবস্যা। চাঁদটি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে যখন ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে, তখন চাঁদের আলোকিত অংশটুকু পৃথিবী থেকে একটু একটু দেখা যেতে শুরু করে। চাঁদের আলোকিত অংশটুকু দৃশ্যমান হতে হতে যখন চাঁদ সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর পেছনে থাকে, তখন পুরো চাঁদটি দৃশ্যমান হয় এবং আমরা সেটিকে পূর্ণিমার চাঁদ বলি। চাঁদের ঘূর্ণনের কারণে আবার চাঁদের দৃশ্যমান অংশটুকু কমতে কমতে একসময় অমাবস্যায় পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। চাঁদের দৃশ্যমান অংশ যখন বাড়তে থাকে, সেই সময়কে বলে শুক্লপক্ষ; যখন কমতে থাকে, তাকে বলে কৃষ্ণপক্ষ।

চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রতি ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় একবার পূর্ণ আবর্তন করে বা ঘুরে আসে। কিন্তু একটি নতুন চাঁদ থেকে পরের নতুন চাঁদ দেখতে সময় নেয় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা। তার কারণ চাঁদ যখন পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হয়, সেই সময়টাতে পৃথিবীটাও সূর্যকে ঘিরে খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করে আসে তাই সূর্যের সাপেক্ষে চাঁদকে একই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য একটু বেশি আবর্তিত হতে হয়। তোমরা যারা আকাশে চাঁদকে লক্ষ করেছ তারা নিশ্চয়ই জানো আমরা সব সময়েই চাঁদের একটি পৃষ্ঠ দেখি, অন্য পৃষ্ঠটি কখনো দেখতে পাই না।

তার কারণ চাঁদ এমনভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যে চাঁদের এক পাশ সব সময় পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে। সাম্প্রতিককালে চন্দ্রাভিযান করার সময় চাঁদের পেছন দিকের ছবি তুলে আনায় আমরা প্রথমবার সেটি দেখতে পেয়েছি।



ছবি: আমরা বাম দিকে দেখানো চাঁদের পৃষ্ঠ দেখে অভ্যস্ত। মহাকাশযান দিয়ে তোলা চাঁদের বিপরীত দিকের ছবিটি ডান দিকে দেখানো হলো।



## জোয়ার ও ভাটা (Tide)

তোমাদের মধ্যে যারা সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকায় থাকে, তারা নিশ্চয় দেখে থাকবে যে সেখানে সমুদ্র এবং নদনদীর পানি দিনে দুই বার করে বাড়ে এবং কমে। উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্র এবং নদীর পানির স্তরের নিয়মিত এই ওঠা এবং নামাকে যথাক্রমে জোয়ার এবং ভাটা বলা হয়। তোমরা সবাই জানো, মহাকর্ষ বলের জন্য সবকিছুই অন্য সবকিছুকে আকর্ষণ করে। সেই হিসেবে সূর্য এবং চাঁদও পৃথিবীর সবকিছুকে আকর্ষণ করে। যদিও পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যের আকর্ষণ চাঁদের আকর্ষণ থেকে অনেক বেশি, কিন্তু বিস্ময়করভাবে পৃথিবীর জোয়ার ভাটার বিষয়টি মূলত ঘটে থাকে চাঁদের আকর্ষণের জন্য। তার কারণ পৃথিবীতে মোট আকর্ষণের পরিমাণ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আকর্ষণের পার্থক্য জোয়ার-ভাটা ঘটিয়ে



ছবি: চাঁদের আকর্ষণে যখন পৃথিবীর পানি ফুলে ওঠে তাকে জোয়ার বলে। পানি ফুলিয়ে তোলার জন্য অন্য জায়গা থেকে পানি সরে আসে এবং সেটাকে ভাটা বলে।

থাকে। সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থাকার কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তার আকর্ষণের পার্থক্য কম। কিন্তু চাঁদ তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর অনেক কাছে, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে চাঁদের আকর্ষণের পার্থক্য অনেক বেশি। সে জন্য চাঁদ পৃথিবীর যে অংশের ঠিক উপরে থাকে, সেই জায়গার পানিকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে স্ফীত করে তোলে এবং আমরা সেটাকে বলি জোয়ার। আবার একই সময়ে চাঁদের অবস্থানের একেবারে বিপরীত দিকে পানির ওপর বল সবচেয়ে কম, সেখানে বিপরীত দিকে বল কাজ করছে কল্পনা করা যায়, তাই সেখানেও উল্টো দিকে পানি স্ফীত হয়ে জোয়ার হয়। একই সময়ে দুই পাশে পানির স্তর স্ফীত করার জন্য যে অংশের পানির স্তর নেমে যায় তাকে ভাটা বলে। জোয়ারের মতো সেই স্থানের একেবারে উল্টোদিকেও একই সঙ্গে ভাটা হয়। অর্থাৎ এক দিনে চারবার সাগর, মহাসাগর এবং উপকূলবর্তী এলাকার নদনদীর পানি ওঠানামা করে। সেই ক্ষেত্রে ছয় ঘণ্টা পর পর জোয়ার-ভাটা হওয়ার কথা, কিন্তু আমাদের যেহেতু চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং সময়ের সাথে সাথে চাঁদের অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে সেজন্য ছয় ঘণ্টার কিছু বেশি সময় পর জোয়ার-ভাটা হয়।

যদিও জোয়ার ও ভাটা মূলত চাঁদের কারণে হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে সূর্যের অবস্থানেরও একটু ভূমিকা আছে। যখন চাঁদ পৃথিবী এবং সূর্য এক সরলরেখায় অবস্থান করে, তখন জোয়ারের পানি একটু বেশি ফুলে উঠে এবং ভাটার পানি বেশি নেমে যায়। কারণ এক্ষেত্রে সূর্য এবং চাঁদের আকর্ষণ বল একই সরলরেখায় কাজ করে বলে পানি বেশি আকর্ষিত হয়। এই অবস্থাকে ভরা কটাল বলে। প্রতি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা ভরা কটাল হয়।

আবার যখন সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ সমকোণে অবস্থান করে, তখন সূর্যের অবস্থানের কারণে পানির স্তর কিছুটা সূর্যের দিকে ফুলে উঠে। এ জন্য জোয়ারের পানি কিছুটা কম উঁচুতে ওঠে এবং ভাটার পানি কিছুটা কম নামে। অর্থাৎ জোয়ার ভাটার তীব্রতা কমে যায়। এই অবস্থাকে মরা কটাল বলে।



ছবি: অমাবস্যা আর পূর্ণিমাতে যখন সূর্য আর চাঁদ একই সরল রেখায় থাকে, তখন জোয়ার এবং ভাটার তীব্রতা বেশি হয় এবং সেটাকে ভরা কটাল বলে।

## সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের আপেক্ষিক অবস্থান

সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদের অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে জোয়ার ভাটা, চন্দ্রকলা ছাড়াও আরও দুটি ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলো হলো সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ।



ছবি: সূর্যগ্রহণ

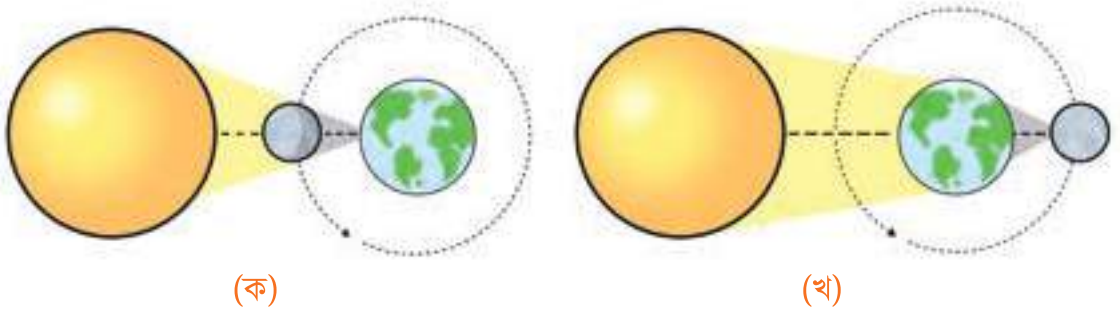
## সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ

যেহেতু সূর্যগ্রহণ খুব বেশি হয় না, তাই সম্ভবত তোমরা সূর্যগ্রহণ খুব বেশি দেখার সুযোগ পাওনি, কিন্তু তোমাদের নিশ্চয়ই কখনও না কখনও পূর্ণ কিংবা আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। চন্দ্রগ্রহণের সময় পূর্ণিমার ভরা চাঁদ হঠাৎ একটা গোলাকৃতি ছায়ায় ঢেকে যেতে থাকে। পূর্ণ নাকি আংশিক চন্দ্রগ্রহণ তার ওপর নির্ভর করে পুরো কিংবা আংশিক চাঁদ ঢেকে যায়। আবার সূর্যগ্রহণ হয় অমাবস্যার সময়, তখন সূর্যটা একটা বৃত্তাকার ছায়ায় ঢেকে যেতে থাকে। অনেক সময় দিনের বেলায় অন্ধকার নেমে একটা রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কাজেই এটা মোটেও বিচিত্র কিছু নয় যে প্রাচীন কালে মানুষ যখন চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণের সময় আসলে কী হয় সেটি জানত না, তাই তারা নানা ধরনের বিচিত্র কুসংস্কার দিয়ে তারা বিচিত্র গল্প তৈরি করত!



ছবি: পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়

এখন আমরা জানি বিষয়টি আসলে খুবই সহজ, চাঁদ যেহেতু পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরে, তাই ঘুরতে ঘুরতে প্রতি অমাবস্যাতেই এটি সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে চলে আসে। ঘটনা ক্রমে যদি পৃথিবী চাঁদ এবং সূর্য একই সরল রেখায় হাজির হয়, তখন চাঁদের কারণে সূর্যটা ঢাকা পড়ে এবং এই ঘটনাকে সূর্যগ্রহণ বলে। যদি সূর্য চাঁদের দ্বারা পুরোপুরি ঢেকে যায়, তবে তাকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বলে। যদি চাঁদের দ্বারা সূর্য আংশিক ঢাকা পড়ে অর্থাৎ চাঁদের আংশিক ছায়া পৃথিবীতে পড়ে, তখন আংশিক সূর্যগ্রহণ হয়।



ছবি: (ক)চাঁদ যখন অমাবস্যায় সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে চলে আসে, তখন সূর্য ঢাকা পড়ে যায় যেটাকে আমরা বলি সূর্যগ্রহণ (খ) পূর্ণিমার রাতে চাঁদে যখন পৃথিবীর ছায়া পড়ে, আমরা সেটাকে বলি চন্দ্রগ্রহণ

ঠিক একইভাবে চাঁদ প্রতি পূর্ণিমাতে পৃথিবীর পেছনে উপস্থিত হয় এবং তখন যদি ঘটনাক্রমে চাঁদ পৃথিবী এবং সূর্য একই সরল রেখায় চলে আসে, তখন চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে এবং আমরা সেটাকে চন্দ্রগ্রহণ বলি। যদি চাঁদ পৃথিবীর ছায়ায় পুরোপুরি ঢেকে যায়, তবে তাকে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ বলে। যদি পৃথিবীর ছায়ার দ্বারা চাঁদ আংশিক ঢাকা পড়ে অর্থাৎ পৃথিবীর আংশিক ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে, তখন আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হয়।

তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে কেন প্রতি অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ হয় না? চাঁদ যদি পৃথিবীর কক্ষপথের একই তলে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করত, তাহলে প্রতি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ দেখা যেত। কিন্তু চাঁদ যেহেতু পৃথিবীর সাপেক্ষে ৫ ডিগ্রি কোণে প্রদক্ষিণ করে, তাই সেটি প্রতি অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে সূর্য আর পৃথিবীকে সংযুক্ত করে সরল রেখায় উপস্থিত হতে পারে না। তবে আগে থেকে হিসাব করে আমরা কবে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হবে সেটি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। ১৫০৩ সালের ৩০ জুন ক্রিস্টোফার কলম্বাস জামাইকার সরলপ্রাণ আদিবাসী মানুষদের চন্দ্রগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করে সেটিকে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে ভয় দেখিয়ে তাদের প্রতারণা করে নিজেদের খাদ্য এবং রসদের ব্যবস্থা করেছিলেন।



ছবি: চাঁদের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের তুলনায় ৫ ডিগ্রি কোণে বেঁকে থাকে

## অনুশীলনী ?

- ১। আকাশে যদি ছবিতে দেখানো চাঁদটি দেখো তাহলে তুমি কি বলতে পারবে, চাঁদটি কি শুক্লপক্ষের চাঁদ নাকি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ?
- ২। কর্কট ক্রান্তি রেখাটি বাংলাদেশের কোন এলাকার উপর দিয়ে গিয়েছে সেটি কি তোমরা বের করতে পারবে?
- ৩। তোমাদের বাসার ছাদে যদি সোলার প্যানেল লাগাতে চাও তাহলে সেটি কোন দিকে মুখ করে থাকতে হবে এবং কেন?